Issue cover not available

Vol. 13 | No. 2 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা

Volume	13
Issue	2
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	December 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i2.3
Pages	93-137
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা

এস. এম. লুৎফর রহমান

বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, ইতিহাস ও ব্যাখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই শব্দটির স্বরূপ নিরূপণে কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেননি। আজ পর্যন্ত তাই 'বাউল' শব্দের অভ্রান্ত ও সর্ববাদীসম্মত ব্যুৎপত্তি-মূল এবং বাউলদের প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এসম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনার সাহায্যে 'বাউল' শব্দের তথ্য ভিত্তিক উৎপত্তি, ইতিহাস ও ব্যাখ্যা নির্দেশ এবং তৎসহ বাউলধর্ম ও সম্প্রদায়েরও আদি ঐতিহাসিক পরিচয়ের ছিন্নসূত্র পুনরুদ্ধার করা হবে।

'বাউল' শব্দের অর্থ

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' অভিধানে 'বাউল' শব্দের পরিচয় নির্দেশ করতে লিখেছেন—'ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় বিশেষ; ইহারা প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান আচার অনুসারে চলে না; সঙ্গীত ইহাদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ।'[১] অর্থাৎ একটি বিশেষ ধর্মমতবাদীদের

১ কাজী আবদুল ওদুদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ, কলিকাতা (প্রকাশকাল অনুক্ত), পৃঃ ৬৬৫।

সম্প্রদায় বুঝাতে 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ কথা সত্য। 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এ শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এশব্দের টীকা লিখেছেন—'উদাসীন ও গায়ক সাধক সম্প্রদায়-বিশেষ; খেপা লোক, পাগোল।'[২] অর্থাৎ সাধারণভাবে ক্ষিপ্ত এবং উন্মাদ অর্থেও 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নির্বিচারে 'খেপালোক' বা 'পাগোল' মাত্রেই 'বাউল' শব্দে বাচ্য নয়। বিশেষ এক ধরণের ক্ষিপ্ত বা উন্মাদ লোকদেরই 'বাউল' বলা হয়। 'চলন্তিকায়' রাজশেখর বসু 'বাউল' নির্ণয় করতে লিখেছেন 'গায়ক ভিক্ষুক সম্প্রদায় বিশেষ। সর্ব সংস্কারমুক্ত এক শ্রেণীর ধর্মাচারী।'[৩] 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাউল' শব্দের তিনটি অর্থের উল্লেখ করেছেন—'বাউল (১) উন্মত্ত, পাগল।... কুঞ্জর বাউল হইয়া... ছুটে। (২) বিহ্বল, কাতর। বিষাদে বাউল মন। (৩) চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ। ইহারা মহাপ্রভুকে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলে। ইহাদের মত 'দেহতত্ত্ব' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা তিলক মালা ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ করে ইহারা শ্মশ্রু গুম্ফ রাখে, কেশ উন্নত করিয়া চূড়াকারে বাঁধে। পরস্পরের সাক্ষাৎকারে 'দণ্ডবৎ' বলিয়া নমস্কার করে।'[৪] 'বাঙ্গালা শব্দ কোষ' গ্রন্থে শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও বাউল শব্দের অর্থ 'বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ'[৫] বলে নির্দেশ করেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'এ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই শব্দের অর্থ 'পাগল, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত' সহ 'বায়ুগ্রস্ত' বলেও উল্লেখ করেছেন।[৬] অতএব

---

২ শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৭১, পৃঃ ৫৬৭।

৩ রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, নবম সংস্করণ, কলিকাতা-১৩৬৯, পৃঃ ৪৬৮,

৪ শ্রী হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ব-স কলিকাতা ১৩৪১। পৃঃ ২০২০-২০২১।

৫ শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাঙ্গালা শব্দকোষ, কলিকাতা ১৩২০, পৃঃ ৬৪০।

৬ শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ন-হ (এলাহাবাদ,) পৃঃ ১০৭৫।

বিভিন্ন অভিধান অনুসারে 'বাউল' শব্দদ্বারা পাগল, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, বায়ুগ্রস্ত, উদাসীন, বিহ্বল, কাতর এবং এক শ্রেণীর গায়ক-সাধক সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝায়।

কিন্তু অভিধানের-প্রোক্ত এসব অর্থ ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বাউল' শব্দের বিবিধ আঞ্চলিক রূপ এবং অর্থভেদও বিদ্যমান।

বাউল শব্দের রূপ ও আঞ্চলিক অর্থভেদ

এ দেশের আঞ্চলিক রূপ ও তদনুযায়ী অর্থানুসন্ধান করলে দেখা যায় —পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলায় 'বাউল' বলতে মাতুর বোঝায়।[৭] খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে 'বাউলে', 'বাউলী' এবং 'বাওয়ালী' শব্দ দ্বারা সুন্দরবনে পথ প্রদর্শক স্থানীয় মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। ঢাকা ও ময়মনসিংহে 'গৃহহীন' মানুষকে 'বাউল্লিয়া' বা 'বাউলিয়া' বলে। বাঙ্‌লা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা 'বাউরা' ও 'বাউরী' শব্দ দ্বারা ক্ষিপ্ত বা মত্ত মানুষকে বোঝায়। ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও পাবনা জেলায় 'বাউল' শব্দ দ্বারা ভিক্ষাজীবী এক শ্রেণীর গায়ক-সাধক সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে থাকে।

এরূপে অঞ্চলভেদে 'বাউল' শব্দের রূপ ও অর্থ বিভিন্নতার ন্যায় বাঙলা ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাষাতেও এই শব্দের নানাপ্রকার রূপ এবং অর্থ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

বাঙলা ও তৎসংশ্লিষ্ট ভাষাসমূহে 'বাউল' শব্দের রূপ ও অর্থ-বৈচিত্র্য

১

'বাউল' শব্দের ন্যায় সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের অর্থ পাগল, উন্মাদ, ক্ষিপ্ত প্রভৃতি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটি দ্বারা কোন সাধক সম্প্রদায়কে নির্দেশ করা হয় না। হিন্দী ভাষায় 'বাউল' শব্দ নেই। এ ভাষায় ব্যবহৃত

৭ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ত থেকে অবশিষ্ট বর্ণ, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৭৫, পৃঃ ২৭০।

'বাউর' শব্দটি সংস্কৃত পূর্বোক্ত 'বাতুল' শব্দের সমার্থক ; কোন সম্প্রদায় নির্দেশক নয়। নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত লিখেছেন—'হিন্দী ভাষায় এই শব্দটি 'বায়ালো', 'বাওল' 'বাওলী' রূপে ব্যবহৃত হয়।'[৮] অসমীয়া ভাষায় 'বাউলি' ও 'বাতুল' উভয় শব্দের-ই প্রয়োগ বিদ্যমান। মাধব কন্দলীকৃত রামায়নের দুই স্থানে এদু'টি শব্দের নিম্নোক্ত প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ক· 'হরি হরি বাপ দশরথ মহীপাল।
কৈকই তোহ্মার ভৈ লন্ত যমকাল ॥
ভরত নৃপতি ভৈলে নখাই বাউলি।
মারিবে কৈকেই মোর মায় বাপ পুলি ॥'[৯]

এবং, খ· 'শুনি পুত্র পুত্র বুলি বিমুহিত ভৈলা।
বাতুল চরিত্র যেন পরি মূর্চ্ছা গৈলা ॥'[১০]

নলিনী রঞ্জন বাবু লিখেছেন—'মাধব দেব (?) কৃত অসমীয়া রামায়নের আদিকাণ্ডে ও 'পাগল' অর্থে বাউল শব্দের উল্লেখ আছে।

'সেই সূর্য্য বংশে তুমি নৃপতি প্রধান,
স্ত্রীতে ভৈলাহা বাউল চিন্তা নাহি আন ॥'[১১]

এসব প্রয়োগের কোথাও সম্প্রদায় অর্থে 'বাউল' শব্দ প্রযুক্ত হয়নি। শেষোক্ত উদাহরণে 'বাউল' শব্দে 'আসক্ত' নির্দেশ করে।

সুরাইয়া কুমার ভুঁইয়া—মাধব কন্দলীকৃত রামায়ন, অসমীয়া সাহিত্যে-তিহাসের তৃতীয় যুগে—প্রাক-বৈষ্ণব আমলে রচিত বলে মন্তব্য প্রকাশ

---

৮ শ্রী নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, বাউল সম্প্রদায়, গৃহস্থ, কার্তিক, ১৩৩০, পৃঃ ২৩।

৯ মাধব কন্দলী, রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী—১ম খণ্ড, ক. বি. ১৯২৯। পৃঃ ১৯৪

১০ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫।

১১ নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫

করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী এই কাল ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।'[১২] বাঙলা দেশের নিকটবর্তী মৈথিল দেশের ভাষায় 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান। শ্রী নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে 'বাউল' শব্দ অনুসন্ধান করে লিখেছেন—'বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর মধ্যে বাউল শব্দ নাই।'[১৩] একথা সত্য নয়। বিদ্যাপতির দুই স্থানে 'বাউল' ও 'বাউলি' শব্দের প্রয়োগ বর্তমান। যথা

ক. 'তোমার বিরহ বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।'[১৪]

এবং, খ. 'হৃদয়ক বাউলি কহি পর জনু
তোঁহৌ কহৌ সয়ানী।
বিনু মাধব রে মধু রজনী যাইতি
মীন কি জীব বিনু পানি॥'[১৫]

শেষোক্ত উদাহরণে প্রযুক্ত 'বাউলি' শব্দটি 'বাউল' শব্দের-ই অন্যরূপ। অতএব অসমীয়ার ন্যায় ব্রজবুলী বা মৈথিলী ভাষাতেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান।

উড়িয়া ভাষায়-ও এই শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক আবিষ্কৃত 'শূন্য সংহিতা' নামক একটি উৎকলীয় পুঁথিতে 'বাউল' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। ময়ুরভঞ্জ থেকে প্রাপ্ত এই গ্রন্থের একস্থানে বলা হয়েছে—

'গোরক্ষ নাথঙ্ক বিদ্যা বীরসিংহ আজ্ঞা
মল্লিকা নাথঙ্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞা॥'[১৬]

---

১২ সুরাইয়া কুমার ভুইঁয়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা, পৃঃ xviii দ্রষ্টব্য।
১৩ শ্রী নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ, ২৪।
১৪ বিদ্যাপতি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, বিদ্যাপতি-পদাবলী নব পর্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, বসুমতি সাহিত্য মন্দির-১৩৪২। পৃঃ ৯৩।
১৫ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪।
১৬ উদ্ধৃত, পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

'বাউলী প্রতিজ্ঞা' অর্থ 'বাউলের পণ'—কঠোর প্রতিজ্ঞা। শব্দটি সম্প্রদায় বাচক। এ গ্রন্থে আরো একবার এই শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়। যথা

'ঋষি তপী সন্ন্যাসী নামক বীরসিংহ।
রোহিদাস বাউলী কপিল যেতে সঙ্ঘ॥'[১৭]

উদ্ধৃতাংশের শেষ চরণে রোহিদাস নামক জনৈক বাউলী বা বাউলের নামোল্লেখ করা হয়েছে। শূন্যসংহিতার সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। তবে এই গ্রন্থের উদ্ধৃতি দান করে নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত লিখেছেন—'অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি' তাহাতে বোধ হয় যে, এই পুঁথি ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে বাউল সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।'[১৮] এ উক্তি সত্য নয়।

সম্ভবত প্রাকৃত ভাষায় রচিত রূপ-গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব নাটকে' সম্প্রদায় বাচক 'বাউল' শব্দের আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে দু'বার 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে শ্রীদাম ও মধুমঙ্গলের কথোপকথনকালে, মধুমঙ্গলের রহস্যময় উক্তির জন্য শ্রীদাম বলছে—'বাউল কিত্তি নিরগ্‌গলং পলবসি।'—ওরে 'বাউল, কেন অনর্গল প্রলাপ বক্‌ছিস?'[১৯] দ্বিতীয় অঙ্কে নান্দীমুখী ও মুখরার মধ্যে কথোপকথনকালে মুখরাকে রাধার অবস্থা জিজ্ঞেস্ করতে নান্দীমুখী বল্‌ছে—'কোরসং চেট্‌ঠই রাহী?'—'রাধা কিরূপ চেষ্টা করছে?' জবাবে মুখরার উক্তি—'বাউলা-বিঅ কিম্পি পলবই।'—'বাউলের ন্যায় প্রলাপ বক্‌ছে।'[২০] অর্থাৎ বাউলের ন্যায় রহস্যময় কথা বলছে।

উভয়স্থানেই 'বাউল' শব্দটি সম্প্রদায় বাচক।

---

১৭ উদ্ধৃত, ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

১৮ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

১৯ রূপ গোস্বামী, বিদগ্ধ মাধব নাটক, রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত ও সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, মুর্শিদাবাদ-১৩৩১। পৃঃ ৪৫।

২০ ঐ, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৭৫।

'বিদগ্ধমাধব নাটকে'র রচনাকাল সম্পর্কে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন—'রূপ গোস্বামী' পুরীতে যে নাটক দুইটি আরম্ভ করিয়াছিলেন (১৫১৬ খ্রী) তাহার একটি সম্পূর্ণ হয় ১৫৮১ সংবতে (১৫২৪) গোকুলে, দ্বিতীয়টি ১৫৫১ শকাব্দে (১৫২৯) ভদ্রবনে।'[২১] এই নাটক দুটির একটি 'বিদগ্ধমাধব' ও অপরটি 'ললিতমাধব'। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'নির্ভরযোগ্য প্রাচীন' পুঁথির পুষ্পিকায় 'বিদগ্ধমাধবের' রচনাকাল নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

'নন্দসিন্দুরবানেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতা।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম॥'[২২]

অতএব ১৫৮১ সংবতে (১৫২৪ খ্রীঃ) রচিত এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'বাউল' শব্দটি বাঙলা নয়—প্রাকৃত এবং ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকেও বাঙ্‌লা দেশে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা রচনায় 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ অণ্বেষণ করলে দেখা যায়—বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে' 'বাতল' (বাতুল?) শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'যমুনা খণ্ডে' কৃষ্ণ, রাধাকে স্বীয় মানসিক অবস্থার কথা জানাতে বলছে—

'বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতে জুআএ মোর পরিতোষে॥'

---

২১ শ্রী সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইষ্টার্ণ পাব্‌লিশর্স, পুনর্লিখিত তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা-১৯৫৯, পৃঃ ৯৬।

২২ ঐ, পূর্বোক্ত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৮৭।

পরবর্তী পদে কৃষ্ণের এই উক্তির জবাবে রাধার উত্তর—

'পাগল হৈল কাহ্নাঞি নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥' [২৩]

বড়ু চণ্ডীদাসের প্রামাণিক পদাবলীতে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়[২৪] কিন্তু পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রচিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' 'বাউল' শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত উক্ত গ্রন্থের একটি পুথির অতিরিক্ত অংশে বলা হয়েছে—

'মুকুল (ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটন কাড়ি রায় বলে মাংস কাড়ি খায়।
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে ॥' [২৫]

'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও তাৎপর্য' নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য এই অংশ উদ্ধৃত করে লিখেছেন—'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়'এ প্রথম আমরা এই শব্দটির ব্যবহার দেখি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' যে কয়খানা পুঁথি মিলাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার সম্পাদনা করিয়াছিল, তাহার একটি পুঁথিতে যে অতিরিক্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

এই খ-পুঁথির লিপিকাল বাঙলা ১২৪৮ সন। ইহাকে যদি আমরা লিপি-করের নিজস্ব সংযোগ বলিয়া সন্দেহও করি এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-

২৩ বড়ুচণ্ডীদাস। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৭ম সংস্করণ, কলিকাতা-১৩৬৮। পৃঃ ৯৬।

২৪ শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, চণ্ডীদাস পদাবলী-১ম খণ্ড, ব. সা. প.-১৩৪১। পৃঃ ১-৩৯।

২৫ মালাধর বসু। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃঃ ৫২৯। উদ্ধৃত, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান-১ম খণ্ড, দীপান্বিতা-১৩৬৪। পৃঃ ৩।

পাদে এই শব্দটির প্রচলন নাও থাকিতে পারে বলিয়া মনে করি, তবু ইহার পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এ সাত-আটবার এই শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের ভনিতযুক্ত বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী-সমন্বিত 'রাগাত্মিকা' পদের মধ্যেও 'বাউল' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।[২৬] উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ প্রথম 'বাউল' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করলেও তিনি, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনাকালে এই শব্দের প্রচলন ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দিহান। অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' খ-পুঁথিতে প্রাপ্ত শব্দটি ও তৎসংশ্লিষ্ট অংশ তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। তার মতে তাই নিসংশয়ে চৈতন্যচারিতমৃতে'ই প্রথম 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর খ-পুঁথির পূর্বোক্ত অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করার কোন কারণ নেই। শ্রী সুকুমার সেনের মতে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত।[২৭] প্রায় একই সময়ে রচিত (১৪৮০-১৫১৬) 'বিদগ্ধমাধব নাটকে' 'বাউল' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়-এর মূল পুঁথিতে শব্দটি থাকা বিচিত্র নয় এবং তা' ছিল বলে স্বীকার্য। তারপর ১৫৫২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত[২৮] চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক চরিতকাব্যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই কাব্যে মুকুন্দ পণ্ডিতের বিদ্বেষী জ্ঞাতি আখণ্ডল আচার্যের আত্মবিজ্ঞানের মধ্যে 'বাউল' শব্দের উল্লেখ দ্রষ্টব্য। আচার্য, মুকুন্দ পণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

'মো হেন সুবুদ্ধি ধীর মোরে কর বাউল।
এই সে কারণে সর্বকার্য হৈল আউল॥'[২৯]

---

২৬ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-৪।

২৭ শ্রী সুকুমার সেন। পূর্বোক্ত। পৃঃ ১২৩।

২৮ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৮।

২৯ উদ্ধৃত, সেন, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩৬০।

৩০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য, সেন, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩৬০।

শ্রী সুকুমার সেন উদ্ধৃত এই অংশের মূল পাঠে 'বাউল' ও 'আউল' শব্দদ্বয়ের যথাক্রমে 'বালু' ও 'আলু' পাঠ পাওয়া গিয়েছে।[৩০] এ যদি লিপিকর প্রমাদ না হয়, তাহলে বলতে হয়—চূড়ামণিদাস হাস্যরসাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়েও 'বাউল' শব্দটি নিসংকোচে ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ পরে আলোচ্য।

একই সময়ে রচিত[৩১] বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' এ 'বাউল' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্য ভাগবত'এর মধ্যখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের 'বায়ুছলে 'প্রেমভক্তি প্রকাশ'-এর সুদীর্ঘ বর্ণনা দান করেছেন। কিন্তু কোথাও 'বাউল' শব্দ প্রয়োগ করেননি। সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করতে করতে মনে হয়, কবি যেন অতি সাবধানে যথেষ্ট সচেতন ভাবে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার পরিহার করে চলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশ লক্ষণীয়।

"নাহি শুনে দেখে লোক কৃষ্ণের বিকারে,
বায়ুজ্ঞান করি লোক বোলে বান্ধিবারে ॥···
পাষণ্ডি দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ুজ্ঞান করি লোক হাসিয়া পালায় ॥'[৩২]

উদ্ধৃতাংশের চতুর্থ চরণে 'বায়ুজ্ঞান করি লোক' স্থানে অনায়াসে 'বাউল বলিয়া লোক' লেখা যেত, কিন্তু কবি তা লেখেননি। এ রকম আরো উদাহরণ দেয়া যায়।

এ গ্রন্থে কবি সর্বদা 'বাউল' শব্দকে পরিহার করেছেন। 'বায়ু' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে বলে যারা মনে করেন—চৈতন্যভাগবতের এই অংশ পাঠে তাঁদের সে ভুল ধারণার নিরসন হওয়া উচিত।

---

৩১ দ্রষ্টব্য, সেন, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩২০।

৩২ বৃন্দাবন দাস। শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, নামপত্র ছিন্ন, পৃঃ ৯৮।

লোচনদাস এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যদ্বয়েও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। তবে 'সহজিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক উদ্ধৃত লোচনদাসের একটি 'রাগাত্মিকা' পদে 'বাউল' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা

'রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগৎ আন্ধা।'[৩৩]

এখানে 'বাউল' শব্দের অর্থ ব্যাকুল। উদ্ধৃতাংশে শব্দটি সম্প্রদায়বাচক নয়।

অতঃপর শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'বাউল' শব্দের তেরোবার প্রয়োগ লক্ষণীয়। তদতিরিক্ত 'মহাবাউল' শব্দটিও এই গ্রন্থে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'চৈতন্যচরিতামৃতে সাত আট বার' 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করেও তার সম্প্রদায়বাচকতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি।[৩৪] কিন্তু চরিতামৃতে বিধৃত 'বাউল' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল লিখেছেন—'এই গ্রন্থে বাউল শব্দের ব্যবহার যে ভাবে করা হইয়াছে তাহাতে ··· আমরা দেখিতে পাইব যে শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং উহার ব্যবহারে বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে। তাহাতেই মনে হয় সেই কালে বাউল সম্প্রদায় বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।'[৩৫] শ্রীসুকুমার সেনের মতে 'চৈতন্যচরিতামৃত' ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত।[৩৬] বাউল সম্প্রদায় সেকালে শ্রদ্ধার পাত্র ছিল কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ; তবে 'চরিতামৃতে' শব্দটি যে কোন ক্ষেত্রে সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—তা সত্য।

---

৩৩ শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু, সহজিয়া সাহিত্য (ক. বি.—১৯৩২), পৃঃ ৭৪।

৩৪ দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫-৪৬।

৩৫ শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল। বাউল তত্ত্বের পূর্বাভাষ, সাহিত্য পত্রিকা, ঢা. বি. শীত সংখ্যা—১৩৬৫, পৃঃ ৩।

৩৬ সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৮।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'বাউল' শব্দের প্রয়োগে শ্রদ্ধার ভাব বিদ্যমান। কবিরাজ গোস্বামী যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যকে 'বাউল' বলে একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। ভক্ত কবি তাঁকে 'মহাবাউল' বা 'শ্রেষ্ঠ বাউল' বলতেও দ্বিধা করেননি। সনাতনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-মাধুর্য আলোচনায় চৈতন্যোক্তিতে পাওয়া যায়—

'আমিত বাউল, আন কহিতে আন কহি
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে আমি যাই বহি।'[৩৭]

উল্লেখযোগ্য যে, বাউলেরাও 'আন কহিতে আন কহে' এবং 'শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-স্রোতে বয়ে যায়'—অর্থাৎ তাঁদের সাধনাও রাধাকৃষ্ণের মধুররসের রাগাত্মিক সাধনা। অতএব, এখানে 'বাউল' শব্দটি যে সম্প্রদায়বাচক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যত্র চৈতন্যোক্তিতে পাওয়া যায়—

'তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস
'বাউল' হইয়া আমি কৈল ধর্ম্ম নাশ ॥ ৮ ॥'[৩৮]

বাউলেরাও এমনি ভাবে 'ধর্ম্মনাশ' করেই 'বাউল' হয়। অন্ত্যলীলা বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যকে যে শ্লোকে 'মহাবাউল' বলে সম্বোধন করেছেন—সেই শ্লোকটি একটি সংস্কৃত গাঁথার অনুবাদ। সংস্কৃত শ্লোকটি নিম্নরূপ

প্রাপ্তপ্রাণষ্ঠাচ্যুতবিত্ত আত্মা,
যযৌবিষাদোজ্ঝিতদেহ গেহঃ।
গৃহীত কাপালিক ধর্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥

---

৩৭ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০৯।

৩৮ ঐ, অন্ত্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৭৯।

('আমার মন বহু যত্নে প্রাপ্ত অচ্যুতরত্ন পুনর্বার হারাইয়া দেহরূপ পরিত্যাগ পূর্বক কাপালিকের ব্রত অবলম্বন করতঃ ইন্দ্রিয় রূপ শিষ্যগণের সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে।')[৩৯]

এই শ্লোকের অনুবাদে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন

'দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন বিষয় ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥'[৪০]

এখানে 'নামধরি' শব্দদ্বয় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি সম্প্রদায়-বাচক কাপালিকের পরিবর্তে সম্প্রদায়-বোধক 'মহাবাউল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কাপালিকের পরিবর্তে 'মহাবাউল' বা 'শ্রেষ্ঠ বাউল' বলা যে কবির পক্ষে সুসংগত ও শোভন হয়েছে, তা' অস্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় ও সাধনায় রাগ-মার্গের বিশেষ স্থান ছিল। বাউলেরাও রাগমার্গী। রাগমার্গীগণ 'রসিক' নামেও পরিচিত। এজন্য মহারসিক শ্রীচৈতন্যকে নির্দেশ করতে কবি 'মহাবাউল' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের, নিকট তখনকার রাগমার্গী বৈষ্ণব-বাউলেরা অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না।[৪১] এ জন্য 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'বাউল' শব্দের প্রয়োগে শ্রদ্ধার ভাব অস্বীকার করা যায় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' 'বাউল' শব্দের আরো প্রয়োগ বিদ্যমান।

---

৩৯ উদ্ধৃত ও অনূদিত, শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৪০ কবিরাজ, পূর্বোক্ত, অন্ত্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৫৪।

৪১ দ্রষ্টব্য, শ্রী সুকুমার সেন. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৪।

চরিতামৃতের আদি লীলায় এই শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা :

১. 'গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ঞিহা আজি হইতে
বাউলিয়া 'বিশ্বাসেরে এথা না দিবে আসিতে ॥'[৪২]

এখানে 'বিশ্বাস' উপাধি, কাজেই 'বাউলিয়া' অর্থ 'বাউল'।

২. 'প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাঁহে কর।'[৪৩]

এ পংক্তিতেও 'বাউলিয়া' শব্দটি সম্প্রদায় সূচক।

অতঃপর চরিতামৃতের মধ্যলীলায় 'বাউল' শব্দটির তিনবার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই লীলা থেকে একটি উদাহরণ পূর্বে চয়ন করা হয়েছে। বাকি উদাহরণ দু'টি নিম্নরূপ—

১. 'কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পতিয়ায়।'[৪৪]

উল্লেখযোগ্য যে বাউলদের কথাও অনুরূপ। বাউলশ্রেষ্ঠ লালন বলেছেন—

মণির মহলে যে লীলা খেলা
বলিতে আকুল হই যায় না বলা।···

কিংবা—

মনবুদ্ধির অগোচর চোরা
বললে কি প্রত্যবি তোরা
আজ আমার কথায়।···

---

৪২ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পূর্বোক্ত, আদি লীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৭।

৪৩ ঐ, পৃঃ ৭৮।

৪৪ ঐ, মধ্য লীলা, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১২০।

অথবা— এ বড় অকৈত্তব কথা
শুনতে লাগে মর্মে ব্যথা।...ইত্যাদি।[৪৫]

অপর উদাহরণ নিম্নরূপ—

২. 'স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল ॥'[৪৬]

এই অংশে বাউল শব্দটির 'ব্যাকুল' অর্থও বিধেয়। উল্লেখযোগ্য যে, বাউলেরা ও মনের মানুষকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল।

অন্ত্যলীলায় 'বাউল' শব্দটি চার স্থানে নয়বার ব্যবহৃত হয়েছে। এই লীলা থেকে দু'টি উদ্ধৃতি পূর্বে দাখিল করা হয়েছে। অপর প্রয়োগ গুলো নিম্নরূপ।

১. 'নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনামূলে হয় দাসী
বাউল হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়।'[৪৭]

এখানে 'বাউল' অর্থ সহজ্ঞানশূণ্যা বা উন্মাদিনী। বাউলদের পোষাক পরিচ্ছেদ কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারও স্বাভাবিক নয়, কিছুটা উন্মাদের ন্যায়।

এই লীলায় ব্যবহৃত অপর স্থানে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তজ্জন্য প্রসঙ্গসহ এই অংশের উদ্ধৃতি আবশ্যক। চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে ছিলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য জগদানন্দের মারফত সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে জানাতে চৈতন্যদেবকে হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় রচিত শ্লোক পাঠান। তাঁর সেই হেঁয়ালীময় ভাষার সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিচয় ছিল। কবির কথায়—

---

৪৫ লালন শাহের এই তিনটি সঙ্গীত মৎ কর্তৃক সংগৃহীত।

৪৬ কবিরাজ, পূর্বোক্ত, মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫০।

৪৭ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, পূর্বোক্ত, অন্ত্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৭২।

'তরজা প্রহেলি আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥'

অতঃপর আচার্যের উক্তি—

'প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল 'বাউল'
'বাউল'কে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি সব প্রভুকে কহিলা॥[৪৮]

শ্রী উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য চরিতামৃতের এই উক্তির 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের অনুমোদিত ব্যাখ্যা' অনুসরণ করে লিখেছেন—'বাউলদের দাবীর যুক্তি অযুক্তির প্রশ্ন না উঠাইয়া স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রহেলিকায় ব্যবহৃত 'বাউল' শব্দের প্রয়োগকে—'উন্মত্ত—ভাবোন্মত্ত বা প্রমোন্মত্ত' অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রহেলিকার অর্থ তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায়,—মহাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুকে বলিও যে, জনসাধারণ তাহার প্রচারিত প্রেমধর্মে আকুল বা বিবশ হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার কৃপায় বিনা সাধনে লোকে প্রেম লাভ করিতেছে বলিয়া এখন আর কেহ প্রেম ভক্তির সাধনানুষ্ঠান গ্রহণ করিতেছে না; সাধন-ভক্তির বৈষ্ণব সম্প্রদায় লোপ পাইতে বসিয়াছে; ভাবীকালের প্রেম-ভক্তি লাভ সাধনার উপদেষ্টা ও নিয়ামক রূপে কোন সম্প্রদায় বর্তমান থাকিবে না। এখন তিনি যে সকল ভাব-বিকাশ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার আর কোন সুবিধা বা প্রয়োজন

৪৮ ঐ, অন্ত্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৭৯।

নাই অর্থাৎ তাহার গ্রাহক জীবলোকে সম্ভবে না। প্রেম-ধর্ম প্রচার ও স্ব-মাধুর্য আস্বাদন যথেষ্ট হইয়াছে। এবং ভাবী জগতের মঙ্গলার্থ তাঁহার লীলা সংবরণ করা উচিৎ। তাঁহার প্রচারিত প্রেম-ধর্মের মর্মজ্ঞ আর একটি ভাবোন্মাদ তাঁহাকে এই বার্তা পাঠাইতেছে।'

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের অনুমোদিত ব্যাখ্যা।[৪৯] এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অতঃপর বলেছেন—'সুতরাং দেখা যাইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে বুঝাইতে বাংলা শব্দে প্রবেশ করে নাই।'[৫০] অদ্বৈত আচার্যের প্রহেলিকা সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের অনুমোদিত এই ব্যাখ্যা যুক্তি নিরপেক্ষ নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের মত শ্রী ভট্টাচার্য এই অংশের বাউলদের ব্যাখ্যার প্রশ্নটি একেবারেই উপেক্ষা করেছেন। কারণ তিনি ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বাঙলা দেশে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলে কোন প্রমাণ সংগ্রহে সক্ষম হন নি। চরিতামৃত এ সময়ের অনেক পূর্ববর্তী কালের রচনা। এই জন্যই হয়তো তিনি উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বাউলদের দাবীকে উপেক্ষা করেছেন।

বাউলরা এই অংশের কিরূপ ব্যাখ্যা দাবী করেন সে সম্পর্কে অবহিত হতে হলে—চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য সম্পর্কে বাউলদের কি ধারণা তা জানা আবশ্যক। বাউল শ্রেষ্ঠ লালন শাহ্ তাঁর 'তোরা যাস্‌নে ও পাগলের কাছে' গানটিতে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যকে 'পাগল' বলে সম্বোধন করেছেন। উক্ত গানটিতে ব্যবহৃত এই 'পাগল' শব্দটি যে 'বাউল' শব্দের সমার্থক তা' ভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি সহযোগে পরে আলোচনা করা হবে। আপাতত এটুকু বলা আবশ্যক যে, লালন শাহের মতে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি 'বাউল' ছিলেন। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ্‌ও বলেছেন—

৪৯ শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

৫০ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

'নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
শাক্ত ভারতীর কাছে
শক্তিমন্ত্র পায়।
গিয়ে রামানন্দের কাছে
বাউল ধর্মের তত্ত্ব পোছে
তবে তো মানুষ ভ'জে
পরম তত্ত্ব পায়॥'[৫০ ক]

অর্থাৎ দুদ্দু শাহ্ও শ্রীচৈতন্যকে স্পষ্টত 'বাউল' বলে অভিহিত করেছেন। তাহলে, বাউলদের মতানুযায়ী চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বোক্ত অংশের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ স্থির করা যায়।

'মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরণে আমার কোটি নমস্কার। মানুষ-তত্ত্ব ভজনাকারী সেই বাউল সাধককে ব'লো—তাঁর রসের ধর্ম গ্রহণ করে সকলে 'বাউল' হয়ে গিয়েছে। তাঁর কৃপায় বিনা আয়াসে রাগানুগা রসিক ধর্ম লাভ করে লোকে এমন উচ্ছৃঙ্খলার সঙ্গে তার অন্ধ অনুষ্ঠান করছে যে, এই ধর্মের 'চাউল' বা তৎকর্তৃক উপদিষ্ট গূঢ় মর্মের প্রতি আর কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলা-মাহাত্ম্যকে তারা এমন সহজ করে তুলেছে যে, উক্ত লীলার অন্তর্গূঢ় সত্যের মহাজনের প্রতি আর কারো আগ্রহ নেই। ক্রেতার অভাবে হাটে চাউলের দোকানদারকে যেমন চাউল নিয়ে বসে থাকতে হয়, তেমনি মহাপ্রভুর মনোনীত দোকানদাররাও (নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, রায় রামানন্দ প্রভৃতি) নবদ্বীপের হাটে খরিদ্দার বা প্রকৃত মর্মগ্রহণকারীর অভাবে বসে আছেন। মহাপ্রভু যাদের বাউল মতবাদ সম্মত সাধন-ভজন-রীতি শিক্ষাদান করেছেন তাদের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান ক্রিয়ার মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। ধর্মাচারের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়েছে। লোকের অতি ব্যগ্রতাই এর কারণ। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শ্রীচৈতন্যের লীলা পরিবর্তন আবশ্যক। নইলে

৫০ ক দ্রষ্টব্য বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত। বাউলগান ও দুদ্দুশাহ্, বাঙলা একাডেমী ১৩৭১, পৃঃ ৬৬।

ভবিষ্যতে তাঁর বাউল ধর্মের প্রকৃত মর্মজ্ঞ কোন সাধক সম্প্রদায় আর অবশিষ্ট থাকবে না। সকলেই বর্তমানে পরিস্ফুট বিকৃত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানকেই 'ধর্ম' বলে মনে করবে। সেই বাউলকে বলবে তাঁর প্রেম-ভক্তি-লীলামাহাত্ম্যের প্রকৃত মর্মজ্ঞ বাউল-ই একথা বলে পাঠিয়েছে।'

চৈতন্যচরিতামৃতের এই অংশ পাঠে বোঝা যায়—চৈতন্যদেবের জীবৎ-কালেই তাঁর অনুপস্থিতিতে নবদ্বীপের রাগমার্গী বৈষ্ণবদের মধ্যে বিকৃতি দেখা দেয়। বৈষ্ণব গোস্বামীরা যা-ই বলুন না কেন অদ্বৈতাচার্যের প্রহেলিকাকে নির-পেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে উক্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যই লাভ করা যায়।

অতএব চৈতন্যচরিতামৃতে সম্প্রদায় অর্থে 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য, পাগল ব্যাকুল প্রভৃতি অর্থেও 'বাউল' শব্দ উক্তগ্রন্থে প্রযুক্ত হয়েছে। চরিতামৃত ব্যতীত সমকাল ও পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীতেও 'বাউল' শব্দের এরূপ নানাবিধ অর্থে প্রয়োগ বিদ্যমান। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'রাগাত্মিকা পদে' এই শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যথা,—

'শুন মাতা ধর্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী।'[৫১]

এখানে 'বাহ্যজ্ঞানশূন্য' অর্থে 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাউলেরাও এমনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদেও অনেক বার 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় যথা—

১. 'সোনার নাতিনী কেন বা এমনি
হইলি 'বাউল' পারা।

---

৫১. শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত, রাগাত্মিকা পদ (ক. বি.) পৃঃ ৬১, পাদটীকায় উদ্ধৃত, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪।

সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা ॥ [৫২]

উদ্ধৃতাংশে 'বাউল শব্দটি সম্প্রদায় বোধক। রাধা 'বাউল সম্প্রদায়ের লোকের মত দুর্বোধ হয়ে উঠেছে—এই অর্থই এখানে দ্যোতিত।

২. 'শুন গো শ্রীমতি এ ধারা কি রীতি
দেখি বাউলিনী পারা
কি হের কি বল কিবা আশা কর
হেন কি তোমার ধারা ॥'[৫৩]

শ্রীমতি রাধার রীতি দুর্বোধ। রাধা বাউল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের মত, যারা কি দেখে, কি বলে, কি কামনা করে কিছুই বুঝা যায় না। তাই কবির জিজ্ঞাসা—রাধার এ কি রকম রীতি যে, তাকে বোঝাই যায় না। উদ্ধৃতাংশের এই অর্থ থেকে সেকালে বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩. 'হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মৈলুঁ
কহিতে কহিতে তনুজরজর
বাউল হইয়া গেলুঁ ॥[৫৪]

এখানেও সম্প্রদায় অর্থে, অর্থাৎ 'বাউলের মত হ'য়ে গেলাম' এই অর্থে 'বাউল' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

---

৫২ শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলী—১ম খণ্ড (ব. সা. প.—১৩৪১), পৃঃ ৪৬-৪৭।

৫৩ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০।

৫৪ শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।

৪. 'আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যেদিকে পায়
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সেদিগে ধায়॥'[৫৫]

এই অংশে 'ব্যাকুল' অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। তবে 'বাহু পসারিয়া' উক্তি থেকে বাউলদের উদ্দণ্ড নৃত্যের কথা স্মরণ হয়। শেষোক্ত পদটি জ্ঞানদাসের ভনিতাতেও পাওয়া যায়।[৫৬]

অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে নরোত্তম দাসের পদে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান। নরোত্তম একটি পদে বলেছেন—

'শুন ওহে বান্ধব কেবা হরিল মোর ধন।
অনেক করিঞা শ্রম পাঞাছিলাম প্রেমধন হেনধন নিলে কোনজন।
কলিঙ্গ দেশেতে ছিল গাছে চড়ি হেথা আইল সঙ্গে করি দুই হাড়ির ঝি।
কি করি কি না করি আপনি বুঝিতে নারি সেই হৈতে বাউল হঞাছি॥'[৫৭]

এখানে সম্প্রদায় অর্থে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কবি নিজেকে 'বাউল' বলেছেন। তিনি আপন ভোলা। তিনি কি করিতে কি না করেন—বুঝতে পারেন না। সেই জন্য তিনি বাউলের মত হয়ে গিয়েছেন। বলাবাহুল্য বাউলরাও এরূপ আত্মভোলা, কি করতে কি না করে—বুঝতে পারে না।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের আরো অনেক বৈষ্ণপদকর্তা তাঁদের রচনায় 'বাউল' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

২

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়—'বাউল' শব্দটি বাঙলা নয়—প্রাকৃত।

৫৫ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৯।
৫৬ দ্রঃ শ্রী সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত, বা. সা. ই., পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪১।
৫৭ ঐ, উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪১।

এই শব্দটি চৈতন্য-পূর্বকাল থেকে অসমীয়া, উড়িয়া, মৈথিল বা ব্রজবুলী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বিকৃত ও অবিকৃত রূপে সম্প্রদায় অর্থে প্রচলিত ছিল। বাঙলা ভাষায়ও এই শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। তবে 'চৈতন্যচরিতামৃতের' পূর্বে বাঙলা কাব্য-কবিতায় 'বাউল' শব্দের' ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। আদি-মধ্যযুগের রচনায় 'বাউল' শব্দের ব্যবহার কদাচিৎ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হেয়ার্থে প্রযুক্ত। উদাহরণ, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর পূর্বোদ্ধৃত অংশ। সেখানে বলা হয়েছে—বাউলদের মাথার চুল এলামেলো, তারা, উলঙ্গ থাকে। রাক্ষস শব্দ উচ্চারণ করে (অর্থাৎ দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে), বিকট চীৎকার করে এবং সবলে মাংস কেড়ে খায়। তাদের গাল বেয়ে রক্ত গলে পড়ে।' এ চিত্র অতিরঞ্জিত হলেও তৎকালীন বাউলদের অধ-পতনের প্রকৃত পরিচয়বহ। কবির বর্ণনা থেকে উক্ত বাউলদের সম্পর্কে সেকালের অ-বাউল জনসাধারণের ঘৃণার তীব্রতা উপলব্ধি করা যায়। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'-এ দেখা যায়, আখণ্ডল আচার্যের মত একটি আত্মচারী হাস্যকর চরিত্রের মুখেও কবি তুচ্ছার্থে 'বাউল' শব্দ আরোপ করেছেন। অতএব 'বাউল' শব্দটি চরিতামৃতের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে হেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল—তা স্বীকার্য।

কারণ স্বরূপ আদি-মধ্যযুগের বাঙলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্য। অনুসন্ধান করলে জানা যায়, পাল নরপতিদের পতনের পর বাঙলা দেশের বৌদ্ধ সমাজ ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ সময় ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজাদের অত্যাচারে বাঙলার অধঃপতিত বৌদ্ধদের সামাজিক জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের অত্যাচারে অধিকাংশ বৌদ্ধ জ্ঞানী-গুণী বাঙলা দেশ ত্যাগ করে উড়িষ্যা, নেপাল, বিহার, চট্টগ্রাম ও আসামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে দেশীয় শিক্ষা ও শাস্ত্র চর্চা রহিত হয় এবং দেশ ত্যাগে অক্ষম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীতে তান্ত্রিকতা ও প্রবল ব্যভিচার আত্মপ্রকাশ করে।

বস্তুত পাল আমল থেকেই মহাযান বৌদ্ধ সমাজের ব্যাপক নীতি-হীনতা দেখা দেয় এবং মহাযানের একটি শাখা 'বজ্রযান'-এর উদ্ভব হয়। ক্রমে সমগ্র বাঙলা দেশ বজ্রযানী বৌদ্ধদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। নবম-দশম শতাব্দীর প্রাকৃত ভাষায় তাদের 'বাজুল'[৫৮] নামে অভিহিত করা হোত। এসব বৌদ্ধ বাজুলদের প্রকৃতি-পুরুষ-ঘটিত মিথুনাত্মক ধর্মচর্চার বিকৃতি সেন রাজাদের দরবার পর্যন্ত কলুষিত করে তোলে। একাদশ শতাব্দীর সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সেন-দরবারের নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বাজুলদে'র বিকৃত জীবন-যাপন প্রণালীর জন্য গোটা বৌদ্ধ সমাজই তখন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী জনসাধারণের অপরিসীম ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন এবিষয়ে আলোকপাত করতে লিখেছেন—এই 'ঘৃণার সীমা···পরিসীমা ছিল না।··· এই ঘৃণার দরুন পূর্ববঙ্গের শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকিণীকে মুসলিম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার পর 'মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া ত্রাণ পাইয়াছিল।··· ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাউল ও নেড়ানেড়ীরা ভীষণ ব্রাহ্মণ্যদলন সহ্য করিতে না পারিয়া রামকেলিতে রূপ-সনাতনের নিকট এবং খড়দহে বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।'[৫৯] অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পরও চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধদের উপর ভীষণ ব্রাহ্মণ্য দলন অব্যাহত ছিল। বাঙলার দেশত্যাগে সামর্থহীন বৌদ্ধগণ ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য নিজেও কাশীতে এবং উড়িষ্যায় বৌদ্ধদের বৈষ্ণব মতবাদে আনয়ন করেন।

ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদের উপর কিরূপ অত্যাচার করতেন তার প্রমাণ বহুল উদ্ধৃত 'শূন্য পুরানে'র 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। এই কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—'হুগলী জেলার

---

৫৮ ভাদে পাদ রচিত ৩৫ নং চর্যায় ব্যবহৃত শব্দ।

৫৯ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড, ক. বি.-১৩৪১, পৃঃ ৩২৪।

জাজপুরে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের উপর যে অত্যাচার করেন, তা সহ্য করতে না পেরে 'বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণ অনেক স্থানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সামাজিক সাম্য ও অন্যবিধ সুবিচার পাইয়া ব্রাহ্মণের সৃষ্টি-সংহারী অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইল।'[৬০] এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এই প্রবল অত্যাচার থেকে অব্যাহতি লাভ করতে যে সব বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা সবাই মুসলমান সমাজে সমান মর্যাদা লাভ করেন নি। অন্যদিকে যাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন—তাঁরা পূর্ব-স্মৃতির এবং বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়েও গোপন বৌদ্ধ সহজাচারের জন্য কুলীন বৈষ্ণবদের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করতে পারেন নি। বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যন্তরে গোপন বৌদ্ধাচারের সংবাদই অদ্বৈতাচার্য হেঁয়ালী পূর্ণ পূর্বোক্ত শ্লোক সমূহে জগদানন্দের মারফত নীলাচলে শ্রীচৈতন্যকে পাঠিয়েছিলেন। তখনকার বৈষ্ণব গোস্বামীগণ এইসব বৈষ্ণবদের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। সেইজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বৌদ্ধাগত রাগমার্গী বৈষ্ণবদের দার্শনিক মতবাদ আলোচিত হওয়ায়, সেকেলে জীব গোস্বামীর ন্যায় অনেকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অভিনন্দন জানাতে পারেন নি। তাঁদের প্রধান আপত্তি ছিল—চরিতামৃতে রাগমার্গী বা নবীন সহজিয়া বৈষ্ণব বাউলদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায়। গ্রন্থটি তাই কুলীন বৈষ্ণবদের নিকট বৌদ্ধ বা 'বাজুল' স্পর্শ দোষের জন্য প্রচারযোগ্য বলে মনে হয় নি।[৬১]

শ্রীচৈতন্যের সময় থেকে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিপীড়িত বৌদ্ধেরা বৈষ্ণবধর্মের ছত্র ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার ধর্মীয় নৈতিক সাম্য, সামাজিক সত্যে পরিস্ফুট হয়নি। অভিজাত ও অনভিজাত তথা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বৈষ্ণবদের আর্থিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে অচিরেই তাই

---

৬০ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৩।

৬১ শ্রী সুকুমার সেন, বা. সা. ই., পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৪-১৪৫।

নৈতিক সাম্য তিরোহিত হয় এবং সর্বহারা শ্রেণীর যে সব বৌদ্ধ 'বাজুল' বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে একটি নতুন 'বাউল' গোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। তাঁরা তখন রাগমার্গী এবং পরে রসিক বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন। অদ্বৈত আচার্য, রায় রামানন্দ, নিত্যানন্দ এমন কি শ্রীচৈতন্যও তাঁদের ধর্মনেতা ছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র সপ্তদশ শতকে বিপুল সংখ্যক নেড়া-নেড়ী তথা 'বাজুল'দের এক যোগে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাদানের পূর্ব পর্যন্ত একদল রাগমার্গী বা রসিক বৈষ্ণব আখ্যায় আপনাদের পোপন করে রাখে। সাধারণ ভাবে বৈষ্ণব বলেই সমাজে তখন তাঁরা পরিচিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সঙ্গে শ্রেণীর বৈষ্ণবদের দার্শনিক তত্ত্ব চরিতামৃতে আলোচনা করেন এবং তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রথম সুযোগ দান করেন। চরিতামৃতে তাঁদের সহজ বস্তুর দার্শনিক তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে বলেই শ্রী সুকুমার সেনের ভাষায়—'চৈতন্যচরিতামৃত বাউল প্রভৃতি মিষ্টিক সাধক, যাঁদের ঠিক বৈষ্ণব বলা চলে না এবং যাঁহারা সাধারণত শাস্ত্রবিধি মানেন না, তাঁহাদেরও আর্যগ্রন্থ রূপে গৃহীত হইয়াছিল।'[৬২] এই কারণেই চারিতামৃত প্রচারের ছন্য বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজের একচ্ছত্র নেতা কুলীর বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর অনুমোদন লাভ করেননি। প্রসঙ্গ ক্রমে আরো উল্লেখযোগ্য যে, বাউলেরা পঞ্চ রসিককে তাঁদের রচনাবলীতে বহুবার উল্লেখ করলেও ষড় গোস্বামী সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ করেন না। সেকালে গোস্বামীদের তথা কুলীন বৈষ্ণবদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত 'বাউল' বৈষ্ণবদের এই বিরোধের জন্যই বনদাস অতি সাবধানে 'বাউল' শব্দটি তাঁর ভাগবতে ব্যবহার করেননি। চূড়ামণিদাস হেয়ার্থে বিকৃত রূপে (বালু) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া জীবনীকার লোচনদাস, জয়ানন্দ ও পদকর্তা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির গ্রন্থেও এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। চৈতন্য সমকালীন একমাত্র কবি গোবিন্দ দাস তাঁর কড়চায় 'বাউল' শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৬২ক] শ্রীচৈতন্যের

৬২ ঐ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৪৭।

৬২ ক দ্রষ্টব্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, গোবিন্দদাসের করতা (ক বি ১৯২৬)

ভ্রমণ সঙ্গী গোবিন্দদাস কর্মকার গৌড়ীয় আব হাওয়া থেকে দূরে থাকায় কড়চা রচনায় তাঁর উদার মনোভাবের ব্যত্যয় ঘটেনি এবং তিনি নিজেও কুলীন ছিলেন না।

এই জন্যেই এয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত রচিত কোন বাঙলা কাব্য-কবিতায় বিশেষ ব্যবহৃত না হলে ও উড়িয়া, অসমীয়া মৈথিল প্রভৃতি ভাষায় 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান। সংস্কৃত প্রাকৃতে রচিত জীব-গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব নাটকে' বাউল শব্দের ব্যবহার থাকায় কুলীন বৈষ্ণবদের বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত বৈষ্ণব-বাউলদের প্রতিবিদ্বেষের অপনোদন হয় না, কারণ 'বিদগ্ধমাধব' নাটক, রাধা কৃষ্ণের কাহিনী কেন্দ্রিক, তার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোন যোগ নেই।

অতএব বাউল-সম্প্রদায় ও 'বাউল' শব্দের উৎপত্তিমূল যে অষ্টম-নবম শতক থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বাঙালীর সমাজ জীবনে বিশেষত ধর্মে ও সাহিত্য নিহত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাউল শব্দের উৎপত্তি

১

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। শ্রী নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত এই শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন '—প্রাকৃত ব্যকরণের নিয়মানুসারে 'বাতুল' শব্দের প্রকৃত রূপ 'বাউল' হয়। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের 'লোপাহনাদ্যযুর্গাদি তৃতীয়ো'—এই সূত্রানুসারে 'বাতুল' শব্দ হইতে 'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করা যাইতে পারে।'[৬৩] কিন্তু 'বাতুল' শব্দ সংস্কৃতে সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অতএব এই প্রশ্নটি থেকে সম্প্রদায় বাচক 'বাউল' শব্দ উদ্ভূত হতে পারে না। নলিনী বাবু অবশ্য

৬৩ শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

এই শব্দের আরো একটি উৎপত্তিমূল নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন —'এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার অন্য একটি সুন্দর নূতন অর্থ অবগত হইয়াছি। তাঁহারা বলেন, এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রাচীন 'বায়ুর'। এই 'বায়ুর' শব্দ হইতে ক্রমে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি;.....ভক্ত যখন বায়ুর মত ভগবানে মিশিয়া যাইতে পারে, তখনই তিনি প্রকৃত বায়ুর বা বাউল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত।'[৬৪] এ উক্তি অগ্রহণীয়। কারণ 'বায়ুর' নামক কোন প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ সাহিত্যাদিতে কোথাও পাওয়া যায় না। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে বায়ুর মত মিশে যেতে পারে না। 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় বলেছেন—'একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজন নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থ দ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন; এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগ-শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন তাহারা বাউল। কেহ বলেন বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এর শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবন-ধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা তাঁহারা বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল। যাঁহাদের আচরণ সাধারণ লোকের তুল্য নহে, লোকে তাহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে। এরূপ সমাজ বহির্ভূত আচার-ব্যবহার সম্পন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাউল।'[৬৫] অর্থাৎ চারুচন্দ্র বাবু 'বায়ু' এবং 'বাতুল' এই দু'টি শব্দের যে কোন একটি থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে বলে মনে করেন। কিন্তু বায়ু শব্দের সঙ্গে 'আছে' অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগে 'বাউল' হয়; 'বাউল' হয় না।

---

৬৪ শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

৬৫ উদ্ধৃত, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, পাকিস্তানের লোক কবি (পা, পা,), পৃঃ ২৭।

পূর্বে আলোচিত 'বাউল' শব্দের প্রচুর আঞ্চলিক রূপের মধ্যে 'বায়ুল' রূপটি কোথাও পাওয়া যায় না। কাজেই এইরূপে বাউল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে না। আর 'বাতুল' থেকে সম্প্রদায় বাচক বাউল শব্দের উৎপত্তি হতে পারে না, তা পূর্বে বলা হয়েছে। তৃতীয়ত শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত যোগ সাধক মাত্রেই 'বাউল' হলে তান্ত্রিক, যোগী ও নাথ-পন্থীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়। অথচ তারা কখনো বাউল শব্দে বাচ্য নয়।

শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র মোহন বসু প্রভৃতির মতেও সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকেই 'বাউল শব্দের উৎপত্তি।[৬৬] হরেন্দ্রচন্দ্র পাল. ডক্টর ভট্টাচার্যের অভিমতের সমালোচনায় লিখেছেন—'ডক্টর ভট্টাচার্য 'বাউল' শব্দকে 'বাতুল' শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করলেও এই 'বাতুল' শব্দের ব্যবহার বাউল গানের কোথাও পাওয়া যায় না। তাছাড়া বাউল সম্প্রদায় কখন ও নিজেদের বাতুল বা পাগল বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন, এমন মনে হয় না। আর বাউল গানের রস-গ্রাহী কোন ব্যক্তি তাহাদের ছন্নছাড়া, বাতুল বা পাগলবলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন ইহা কখনই হইতে পারে না।'[৬৭] বলা বাহুল্য, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিমতের বিরুদ্ধে এই যুক্তি অকাট্য নয়। কারণ 'বাউল' অর্থে বাউল শব্দের ব্যবহার বাউল গানে বিশেষ লক্ষ্য করা না গেলেও, 'পাগল' শব্দের প্রয়োগ অলক্ষ্য নয়। বাউলরা স্পষ্টরূপে নিজের 'পাগল' বলে উল্লেখ করেছেন। লালন বলেছেন

পাগল ভেবে পাগল হইলাম
সেই পাগলকে শরণ লইলাম
আপন-পর তো ভুলি নাই।

---

৬৬ দ্রষ্টব্য, (ক) শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

(খ) M. M. Bose, Ragatxmika Padar Vyakhaya Journal of the Departments of Le.ters, Vo!. xxii (C. U.-1932), p. 66.

৬৭ হরেন্দ্রনাথ পাল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

অধীন লালন বলে
আপনার-আপনি ভুলে
ঘটে প্রেম-পাগলের এমনি বাই ॥

বাউলরা পাগল। তবে বিশেষ ধরণের পাগল। লালনের ভাষায় 'প্রেম-পাগল' বা ঐশ্বরিক প্রেমে উন্মাদ। 'বাতুল' শব্দের অর্থ 'পাগল হলে, বাউলদের সঙ্গে এই শব্দটির কোন সম্পর্ক নেই। বাউল-গানে 'পাগল' বলতে 'প্রেম-পাগল' এবং ভাষায় এই শব্দের অর্থ সাধারণ ভাবে উন্মাদ নয়—সংসার ত্যাগী তপস্বী বা আত্মভোলা সাধক, ঐশ্বরিক প্রেমে 'দিউয়ানা।' বাউল-গীতিতে 'পাগল' ও 'বাউল' শব্দদ্বয় এরূপ সমার্থক বিধায় বাউলদের উক্ত বিশেষ অর্থে পাগল বলা অসমীচীন নয়; কারও নিকট তা অনভিপ্রেতও হতে পারে না।

কিন্তু পাগল বা বাতুল শব্দের সমার্থক হলেও এ তিনটি শব্দের উৎপত্তিমূল অভিন্ন নয়। কারণ 'বাতুল' শব্দ দ্বারা এমন কোন বিশেষ স্তরের পাগলকে নির্দেশ না করে সমগ্রভাবে নির্বিচারে উন্মাদ মাত্রকেই বোঝায়। এজন্য 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি অসিদ্ধ।

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়কালে আহমদ শরীফ বলেছেন—'বাউর' (এলোমেলো; বিশৃঙ্খল, পাগল) থেকেই বাউল নামটির উৎপত্তি হয়েছে।'[৬৮] উল্লেখযোগ্য যে, 'বাউর' শব্দটি হিন্দী। অর্থ পাগল, উন্মাদ প্রভৃতি। 'প্রাকৃত প্রকাশ', 'সংক্ষিপ্তসার' প্রভৃতি ব্যাকরণের 'রলয়োর্ভেদ' ..... সূত্রানুসারে 'বাউর' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হলেও এই শব্দটি থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব ঘটেনি। কারণ 'বাতুল' শব্দের ন্যায় 'বাউল' শব্দটিও সম্প্রদায় বাচক নয়।

---

৬৮ আহমদ শরীফ। বাউল তত্ত্ব। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা (বসন্ত সংখ্যা ১৩৭০) পৃঃ ৩০।

এতদ্ব্যতীত, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিমতের সমালোচনা করে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন—'বাউল' বস্তুতঃ ব্‌লী (বা ওয়্‌লী) শব্দের সহিত সংস্পৃষ্ট। মহাবাউল বা শ্রেষ্ঠ বাউল বলিতে বুঝি আউব্‌ল বলী (আউল ওয়্‌লী) বা উয়ালীয়ে আউল। এই আউল ওয়্‌লী-ই বোধ হয় আউল-বাউল রূপে বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।[৬৯] বলা বাহুল্য, এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 'ব্‌লী' শব্দের সঙ্গে 'বাউল' শব্দের কোন সংযোগ নেই। মহাবাউল বা শ্রেষ্ঠ-বাউল বলতে মহান বাউল-সাধককে বোঝায়। কিন্তু 'আউল-ওয়্‌লী বা উয়ালীয়ে আউল' (শব্দটি সম্ভবত উয়ালীয়ে আউলিয়া হবে) বলতে কোন 'বাউল-সাধককে না বুঝিয়ে একমাত্র খোদাভক্ত কামিল ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। তাদের সঙ্গে বাউলদের কোন যোগ নেই। এই জন্য, শ্রীচৈতন্যকে মহা-বাউল আখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও তাঁকে 'আউলিয়া' নামে অভিহিত করা যায় না। 'উয়ালীয়া আউলিয়া' তো নয়-ই। এইজন্য 'ওয়্‌লী' শব্দ থেকে বাঁউল শব্দের উৎপত্তি অর্থগত কিংবা ধ্বনিগত কোন দিক থেকেই সিদ্ধ নয়।

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে 'আউয়াল শব্দ থেকে 'আউল ও তা থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব।[৭০] 'আউল' ও 'বাউল' উভয়-ই গোষ্ঠী বাচক শব্দ হলেও, পূর্বেই বলা হয়েছে 'আউল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি ঘটেনি। আউল-ওয়্‌লী থেকেও বাঙলা সাহিত্যে 'আউল-বাউল' শব্দের প্রচলন হয়নি। 'আউলিয়া' শব্দের অপংভ্রশ নয়। 'আউল' অপেক্ষা 'বাউল' শব্দের ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনেক প্রাচীন।

ডক্টর আহমদ শরীফ এই প্রসঙ্গে একটি নতুন কথা বলেছেন 'আউয়াল' থেকে 'আউল' শব্দের উৎপত্তির সম্ভাবনা স্বীকার করে লিখেছেন—'বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নামটিও আউল চাঁদ।

---

৬৯ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৭০ দ্রষ্টব্য, আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।

হয়ত আউয়ালবাদী (আগমবাদী) বলেই তাঁর নাম আউল চাঁদ। কিংবা আউল চাঁদের অনুসারীরাই 'আউল' নামে পরিচিত।[৭১] বলা বাহুল্য আউল চাঁদের অনুসারীরা 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় নামে পরিচিত—'আউল' 'বাউল' বা আউলে ফকীর বলে নয়: 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের মুদ্রিত পুস্তক 'সহজতত্ত্ব প্রকাশ' থেকে জানা যায়—'কর্তভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একজন মুসলমান ফকীর। ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে (বাঙলা ১১০১ সাল) তিনি পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে আসেন এবং দীর্ঘদিন রামশরণ পালের বাড়ীতে বাস করিয়া ধীরে ধীরে অতি সঙ্গোপনে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিয়া ২২ জন শিষ্য করেন এবং শেষে রামশরণ পালকে মোহান্ত বা প্রধান গুরু (কর্তা বাবা) করিয়া একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।'[৭২] উল্লেখযোগ্য যে, 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'বাউল' সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস বিজড়িত নয়। বাউল-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনেক পূর্বে। কর্তাভজা সম্প্রদায়কে অন্যান্য অনেক গোষ্ঠীর ন্যায় বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হলেও আসলে কর্তাভজা দল একটি ভিন্ন শাখা। এই শাখার আদি-প্রবর্তক বাউল সম্প্রদায়ের আদি-স্থাপয়িতা নয়। ফলে কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তকের নাম 'আউল' (চাঁদ) হলেও 'বাউল' শব্দ ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি তাঁর নাম থেকে ঘটেনি। বাউলরাও তাই আউল চাঁদকে তাঁদের ধর্মের মতে, চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র থেকে বর্তমান বাউল মতবাদের উৎপত্তি। এ বিষয়ে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—'নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতেই সম্প্রদায় হিসাবে প্রকাশ্যভাবে এই পুরুষ-প্রকৃতি মিলন-ঘটিত ধর্ম-সাধনা বা বাউল-ভজন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গুরু পরম্পরার মধ্য দিয়া সারা বাংলায় ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপের ও বর্ধমান জেলার অনেক বাউল আমাকে বীরভদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া

---

৭১ আহম্মদ শরীফ। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।

৭২ উদ্ধৃত, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮।

তাদের গুরু বংশের তালিকা দিয়া তের কি চৌদ্দ গুরু তাহাদের গুরু—এই রূপ বলিয়াছে।'[৭৩] কাজেই 'বাউল' ও 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় যে অভিন্ন নয়, তা সত্য। উভয় সম্প্রদায়ের গুরু তালিকা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আউল' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা তাই অসমীচীন।

ডক্টর আহমদ শরীফ আরো লিখেছেন—'আকুল থেকে 'আউল' এবং 'ব্যাকুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নয়।'[৭৪] কিন্তু 'আকুল' শব্দটি গোষ্ঠীবাচক নয়, 'ব্যাকুল' শব্দ ও তাই। কাজেই 'আকুল' হতে 'আউল' ও 'ব্যাকুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি অযৌক্তিক।

২

বিশেষজ্ঞদের অভিমত ব্যতীত বাঙলা অভিধান, শব্দকোষ প্রভৃতি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—উইলিয়ম কেরী তাঁর 'A Dictionary of Bengali Language' এ 'বাতুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করেছেন।[৭৫] 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত 'ব্যাকুল' থেকে প্রাকৃতে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি বলে নির্দেশ করেছেন।[৭৬] শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' গ্রন্থে লিখেছেন—'বাউল

[হি—বাউলা ; বাওলা ; বাওল ; বাউলী ; অস—বাউল ;···সং বাতুল হইতে, মতান্তরে বাউর হইতে, র =ল।'[৭৭] অর্থাৎ তাঁর মতে সংস্কৃত 'বাতুল' থেকে হিন্দী, অসমীয়া ও বাঙলায় 'বাউল' শব্দের প্রচলন। কিন্তু 'বাতুল' 'ব্যাকুল' বা 'বাউর' শব্দ থেকে যে সম্প্রদায়বাচক 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি হতে

---

৭৩ শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৪।

৭৪ আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৩০।

৭৫ W. Carey, A Dictionary of Bengali Lrnguage—1825. উদ্ধৃত, শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

৭৬ শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপধ্যায়. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২০-২০২১।

৭৭ শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পূর্বোক্ত. পৃঃ ৬৪০।

পারে না, তা পূর্বে বলা হয়েছে। আধুনিক কালে রচিত শব্দকোষ, অভিধানে ও অপর কোন নতুন উৎপত্তি-মূল প্রদর্শিত হয়নি।

অতএব, বাউল শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচক গবেষকদের রচনা থেকে কোন সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না। বিভিন্ন অভিধান, শব্দকোষ থেকেও এই শব্দের একটি মাত্র উৎপত্তিমূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় তাই দুরূহ। কিন্তু অসম্ভব নয়।

৩

'বাউল' শব্দের উৎপত্তি-মূল নির্ণয়ের জন্য অদ্যাবধি কেউ চর্যাপদ ও অবহট্‌ঠ গীতিকবিতায় কিংবা প্রাকৃত ভাষায় অনুসন্ধান চালানো আবশ্যক মনে করেননি। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় 'বাউল' শব্দের প্রচলন ছিল, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। চর্যাপদে—পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে প্রচলিত অনেক প্রাকৃত এবং বাঙলা শব্দের পূর্বরূপ বিধৃত রয়েছে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এই স্তরের ভাষায় অনুসন্ধান করা বিশেষ আবশ্যক।

চর্যাপদে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ নেই। অবহট্‌ঠ গীতি-কবিতাতেও নেই। কিন্তু এই শব্দটির অতি নিকটবর্তী পূর্বরূপ চর্যাপদে বিদ্যমান। ভাদে পাদ রচিত পঁায়ত্রিশ নম্বর চর্যায় বলা হয়েছে

বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পণিআ॥[৭৮]

অর্থ: 'বাজুল আমাকে লক্ষ্য বলে দিল। আমি গগনের পানি পান করলাম।'

চর্যাপদ-সম্পাদক শ্রী সুকুমার সেন[৭৯] ও মণীন্দ্রমোহন বসু[৮০]

৭৮। দ্রষ্টব্য, Dr. Muhammad Shahidullah. Buddhist Mystic songs (University of Karachi—1960). P.62.

৭৯। দ্রষ্টব্য, শ্রী সুকুমার সেন। চর্যাগীতি পদাবলী (সাহিত্য সভা, বর্ধমান-১৯৫৬) পৃঃ ১৮০।

৮০। দ্রষ্টব্য, শ্রী মণীন্দ্রমোহন বসু। চর্যাপদ (ক. বি.—১৯৪৩)। পৃঃ ১২৮।

'বাজুল' শব্দটির অর্থ 'বজ্রগুরু' বলে নির্দেশ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এর অর্থ করেছেন 'বজ্রকুল' [৮১] সম্ভবতঃ তাঁরা এই শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে চর্যাপদের সংস্কৃত টীকার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন। টীকায় বলা হয়েছে—'বাজুলেত্যাদি'। বজ্র কুলেনেতি। বজ্রগুরুণা লক্ষ্যমিতি ভাবমুক্তং মহ্যং চতুর্থানন্দোপায়ং প্রদত্তং।'[৮২] এই টীকার উপর নির্ভর করায় তাঁরা 'বাজুল' শব্দের আধুনিক রূপান্তরে 'বজ্রগুরু' ভিন্ন 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করেননি। টীকা রচনাকালে 'বাউল' শব্দের প্রচলন হয়নি, টীকাও সংস্কৃতে লেখা। অতএব, 'বজ্রগুরু' 'বজ্রকুল' প্রভৃতি 'বাজুল' শব্দের আধুনিক রূপান্তর নয়, অর্থ। চর্যাপদের কবি-সাধকগণ বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিলেন। এই রজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই সহজিয়া বাজুল ও বাউল সম্প্রদায়ে বিবর্তিত হয়। চর্যাপদের ভাষাকে একালের ভাষায় রূপান্তরকালে তাই 'বাজুল' শব্দের স্থানে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ অধিকতর সমীচীন। 'বাজুল' শব্দটির পরিবর্তিত পরবর্তী রূপ 'বাউল'। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব নাটকে' এই 'বাজুল' সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই 'বাউল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চর্যাপদে 'বাজুল' শব্দের প্রয়োগ মাত্র একবার করা হয়েছে। কিন্তু 'বাউল' সম্প্রদায়সূচক বা 'বজ্রগুরু' অর্থনির্দেশক আরো একটি শব্দ যথাক্রমে সতেরো ও পাঁচিশ নম্বর চর্যায় বিদ্যমান।

বীণাপাদ সতেরো সংখ্যক চর্যার শেষ দুই পংক্তিতে বলেছেন—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥[৮৩]

৮১। Dr. Muhammad Shahidullah. Ibid. P.62 & P. 108.

৮২। দ্রষ্টব্য। শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধগান ও দোঁহা (ব. সা. প.—১৩২৩)। পৃঃ ৫৫।

৮৩ দ্রষ্টব্য, Dr. Md. Shahidullah. Ibid. p. 36.

অর্থঃ 'নাচেন বজ্রধর, গাহেন দেবী (বজ্রগুরুর সাধন সঙ্গিনী ?) বুদ্ধ নাটক সমাপ্ত হয়।'

তিব্বতীয় অনুবাদ অনুযায়ী শ্রী সুকুমার সেন কর্তৃক পঁচিশতম চর্যার কল্পিত প্রাচীন পাঠে 'বাজিল' শব্দটির আর একবার ব্যবহার লক্ষণীয়। উক্ত চর্যায় বলা হয়েছে—

বইঠ ম নিতি [শূণত পাই]।
তন্ত্রী [ছাড়ি বাজিল হোই]॥[৮৪]

চর্যাপদের আলোচক-সম্পাদকগণ 'বাজিল' শব্দের আধুনিক রূপান্তর কালেও সংস্কৃত 'বজ্রধর' শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৮৫] অতএব 'বাজিল' ও 'বাজুল' যে একই শব্দের ভিন্নরূপ—তা স্বীকার্য।

অবহট্‌ঠে রচিত সরহ ও কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ' অনুসন্ধান করলে 'বাউল' 'বাজুল' 'বাজিল' শব্দত্রয়ের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। দোহাকোষের ভাষা চর্যাপদের পূর্ববর্তী। এ ভাষায় 'বাজুল' ও 'বাজিল' শব্দ না থাকলেও একই অর্থবোধক সম্প্রদায়বাচক 'বাজির' ও 'বজ্জিল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কাহ্ন বা কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষে 'বাজির' শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান। কাহ্ন লিখেছেন—'জে কিঅ নিচ্চল মণ রয়ণ (নিঅ ঘরণী) লই এথো।
সো বাজির নাহুরে ময়ি বুত্ত পরমথো॥'[৮৬]

অর্থঃ 'যে নিজ গৃহিণীকে নিয়ে মন-রত্নকে নিশ্চল করেছে—সেই বজ্রধর নাথ—আমি পরামার্থ বলে দিলাম।'

৮৪। দ্রষ্টব্য, শ্রী সুকুমার সেন। চর্যাগীতিপদাবলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।

৮৫। দ্রষ্টব্য, (ক) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।
(খ) Dr. Shahidullah. Ibid. P. 36.
(গ) শ্রী সুকুমার সেন। চ. গী. প. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১ ও ৮১।

৮৬। দ্রষ্টব্য, শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।

সরহের দোহাকোষে 'বাজির' শব্দের প্রয়োগ নেই, কিন্তু 'বজ্জিল' শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান। সরহ বলেছেন—

'জোইণিগাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উপসন্ন।'[৮৭]

অর্থ: 'যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গণে বজ্রধর সহজে আবির্ভূত হয়।' এখানে 'বজ্জিল' শব্দটি যে 'বাজির' 'বাজিল' ও 'বাজুল' শব্দের সমার্থক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অতএব, চর্যাপদ ও অবহট্‌ঠ গীতি-কবিতায় প্রাপ্ত বাজুল, বাজিল, বাজির, বজ্জিল মূলত একই শব্দের বিভিন্নরূপ। এসব শব্দ সর্বদাই সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত এবং বৌদ্ধ বজ্রযানী সাধক নির্দেশক। এ-শব্দগুলোর সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় রচনায় অনুস্যূত 'বাউল' শব্দের শুধু যে অর্থ-সাদৃশ্য রয়েছে তাই নয়; 'বাউল' শব্দের সঙ্গে এ-শব্দাবলী'র একটি অখণ্ড ক্রমবিকাশের ধারাও লক্ষণীয়।

বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি

বজ্রযানী বৌদ্ধেরা বজ্রসত্ত্বের উপাসক ছিলেন। বজ্রসত্ত্বের অপর নাম হেরুক। তিনি ভগবান। তাঁকে পরম আনন্দ-স্বরূপেও বজ্রযানী বৌদ্ধেরা কল্পনা করেছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গ্রন্থ 'মহা যোগিনী তন্ত্র-রাজ'এর প্রথম পটলে বলা হয়েছে—

'ইত্যাহ ভগবান বজ্রী মহাবীরেশ্বর অথাগতঃ
সর্ব্ববীরসমায়োগাৎ বজ্রসত্ত্ব পরং সুখং।'[৮৮]

'পরম সুখ স্বরূপ' এই বজ্রসত্ত্ব 'ভগবান বজ্রী'র উপাসকগণ-ই বজ্রধর। বজ্র-সত্ত্বই

৮৭। উদ্ধৃত, শ্রী সুকুমার সেন, চ, গী, প, পৃঃ ৩৪।

৮৮। দ্রষ্টব্য, শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।

বজ্রধরদের পরম গুরু। তিনি এই দেহেই অধিষ্ঠিত। তাই কৃষ্ণাচার্য বলেছেন—

'স বজ্রগু [রু] কা [অ] বাঅ মণ মিলিঅ বিফুলই
তহি সো দূরে।
সো এহু ভঙ্গে মহাসূহ নিব্বাণ এথুরে॥[৮৯]

'মহাসুখ' রূপ 'বজ্রগুরু' শরীরে 'বীজ' স্বরূপা। তাঁকে দেহে রক্ষা করাই সাধনা। যে মানব, দেহস্থ ভগবান বজ্রী বা উক্ত বজ্রসত্ত্বের সাধনা করেন—তিনিই সিদ্ধিলাভ করলে বজ্রধর নাথ পদবাচ্য। আর যাঁরা এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন তারাই বজ্জিল, বাজির, বাজিল, বাজুল বা একালের পরিভাষায় বাউল।

অতএব, বজ্রসত্ত্বের উপাসক 'বজ্রী' শব্দ থেকে সম্প্রদায় বাচক বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা যায়। ব্যুৎপত্তিটি এরূপ—√বজ্ (গমণ করা) +র =বজ্র>সম্প্রদায় সূচক সং.বজ্রী>অপ.বজ্জির>বাজির } বাজুল>বাউল।
+
বজ্জিল>বাজিল }

প্রাকৃত ব্যাকরণের পূর্বোক্ত 'রলয়োর্ভেদ...'সূত্রানুসারে বজ্জির>বজ্জিল এবং বাজির>বাজিল নিষ্পন্ন হয়। একই ভাবে অপর সূত্রানুসারে (ই=উ) বাজিল>বাজুল হওয়া সম্ভব। তৎপর 'প্রাকৃত প্রকাশ' উক্ত 'কগচজতদপয় বাং প্রায়ো লোপঃ.....'সূত্রানুসারে বাজুল>বাউল শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ। তাহলে 'বজ্রী' শব্দ থেকে যে পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'বাউল' শব্দটি মূলত প্রাকৃত। শব্দটি প্রাকৃত থেকে প্রথমে বাঙলা ও পরে অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় প্রবেশ করে। 'বজ্র' শব্দের সঙ্গে যোগ সাধনার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। যোগশাস্ত্রে 'বজ্রাসন' নামক একটি

৮৯। দ্রষ্টব্য, শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩১।

সাধনকৃত্যের-ও উল্লেখ রয়েছে। যোগ অতি প্রাচীন ধর্মাচার। তন্ত্রও তাই। উভয় ধর্মই আদিম মানুষের যৌনাচার ভিত্তিক ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যোগ ও তন্ত্রাচার মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে গৃহীত হবার পর খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে বজ্রযান ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই বজ্রযানী বৌদ্ধদের ধর্মমত ও সাধন প্রক্রিয়াই কালোচিত পরিবর্তনের মাধ্যমে 'বাউলধর্ম' রূপে আজো টিকে আছে। তাই 'বজ্র-গীতিকা' 'দোহাকোষ-গীতিকা' ও 'চর্যা-গীতিকা'র সঙ্গে 'বাউল-গীতিকা'র অভঙ্গযোগ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত পক্ষে 'বজ্র-গীতিকা'ই আদি বাউল-গীতিকা, বাঙলার ও বাঙালীর প্রথম সাধন সঙ্গীত।

বাউল শব্দের ব্যাখ্যা

৬ষ্ঠ-৭ম শতকের বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাউল ফকীর সম্প্রদায়—অভিন্ন নয়। কাল-ব্যবধানের ন্যায় ভাষা, ভাব ও মতবাদের মধ্যেও অনেক ব্যবধান রচিত হয়েছে। কিন্তু যোগসূত্র হারায়নি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাউল সমাজে তাই পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে প্রচলিত 'বাউল' শব্দ গৃহীত হলেও অর্থের পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ব্যাখ্যা হাজির হয়েছে। বাউল শ্রেষ্ঠ লালন শাহ্-ই এই শব্দের নতুন ব্যাখ্যা দান করেছেন। লালন শাহের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে লিখেছিলাম—'লালন-পূর্ববর্তীকালে বাউলধর্ম' বলতে বোঝাত—তান্ত্রিক সহজিয়া যোগাচার। তার ফলে প্রাক-লালন পর্বে রচিত কোন গীত বা গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের স্থিরতর অর্থ নেই।···লালন শাহ্-ই সর্ব প্রথম শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি বাউল শব্দের অর্থ করেছেন—'আসানুসন্ধানী'। পূর্বোক্ত শব্দের সঙ্গে এই শব্দটির উৎপত্তিগত প্রভেদ-ও লালন শাহ্ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন—

আমার 'আপন খবর' নাহিরে কেবল
'বাউল' নাম ধরি ॥
বেদ-বেদান্তে নাই যার 'উল্'
শুধুই কেবল নামে মশ্গুল
এ জগৎ ভরি,
'খবর'দার কারে বলা যায়
কিসে হয় খবর'দারি ॥
আপনার আপনি যে জেনেছে
'বা-উলের 'উল্' সেই পেয়েছে
সেই হুঁশিয়ারী।
কত মুনি, 'ন্যাসী, যোগী, তপস্বী
'খবর' পায় না তারি ॥
আউল, বাউল, আরেফ, কামেল
আত্মতত্ত্বে হয়ে ফাজেল
যে দ্বারের দ্বারী।
আমি লালন পশুর চলন
কেমনে তরি ॥

এ কবিতায় 'বাউল' শব্দটি যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়—আরবী با (বা = অর্থ আত্ম) এবং ফার্সী ال (উল = অর্থ সহিত, খবর বা সন্ধান) শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রনে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। এই অর্থারোপ লালন শাহের স্বকৃত এবং মৌলিক।'[৯০] বর্তমানে এই বক্তব্য কিছুটা সংশোধন অবশ্যক। প্রাক-লালন পর্বে রচিত গীতে ও গ্রন্থাদিতে 'বাউল শব্দের প্রচুর রূপ বৈচিত্র্য ও অর্থ-বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই সব প্রয়োগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়

৯০ দ্রষ্টব্য, সাহিত্য-পত্রিকা, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত, বাঙলা বিভাগ, ঢা. বি., সংখ্যা—১৩৭৪ বর্ষা। পৃঃ ৭১-৭২।

অর্থেও বাউল শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। কাজেই প্রচলিত 'বাউল' শব্দের সঙ্গে লালন শাহ তাঁর উক্ত গানে ব্যবহৃত 'বাউল' শব্দের কোন উৎপত্তি গত প্রভেদ নিরূপণ করেননি। আরবী 'বা' ও ফার্সী 'উল্' শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণে 'বাউল' শব্দের সৃষ্টি নয়। লালন শাহ্ ভাষা-তাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি প্রচলিত সম্প্রদায়বাচক 'বাউল' শব্দের-ই একটি নতুন ও মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র। শব্দটি তিনি দার্শনিক পরিভাষা রূপে গ্রহণ করে তাকে নতুন অর্থারোপে দীপ্যমান করে তুলেছেন। লালন শাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত 'বাউল' শব্দের এই ব্যাখ্যা যে তদীয় সমাজ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং যুগোপযোগী—তা সত্য।

লালন শাহের পূর্বোক্ত গানটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়—তিনি 'বা' শব্দের অর্থ 'আপন' (আত্ম), 'উল' শব্দের অর্থ 'খবর' এবং 'বা' 'উল' শব্দে 'খবরদার' (আত্মানুসন্ধানী) নির্দেশ করেছেন। লালন শাহের বহু গানে এই 'উল্' এর উল্লেখ রয়েছে। যথা—

১. আছে আল্লা আলে
রসুল কলে
তলের 'উল্' হোল না ॥…

২. লীলে পায় স্থিতি সেই ফুলে
সাধকের মূল বস্তু এ ভূমণ্ডলে
সে যে বেদের অগোচর
সে ফুলের নাগর
সাধুজনা ভেবে করছে রে 'উল্' ॥…

৩. মাস অন্তে ফোটে সে ফুল
কোথা গাছ কোথা রে মূল
জানিলে তাহার 'উল'
ঘোর যায় ছুটে।…

৪. চারি রাহায় চারি মকবুল
ওয়াহ্‌দানিয়াতে রসুল
শিরাজ শাঁই কয় না জেনে 'উল্'
লালন তুই ঘুরিস কেনে॥ ··

'উল্' শব্দটির ন্যায় 'খবর' শব্দটিও বিশেষ অর্থে লালন বহু গানে ব্যবহার করেছেন।

১. আপন আপন 'খবর' নাই
গগনের চাঁদ ধরব বলে
মনে করি তাই॥···

২. পাখীর আসা-যাওয়ার দ্বার
আছে সন্ধির পর
ফকীর লালন বলে কেউ কেউ
প্রাপ্ত সে 'খবর'॥

৩. আপন ঘরের 'খবর' নেনা
অনায়াসে দেখতে পাবি
কোন খানে কার বারাম খানা॥

৪. যেপথে শাঁই চলে ফেরে
তার 'খবর' কে করে॥

'বাউল' শব্দের এরূপ বিশ্লেষণী প্রয়োগ অপর কোন বাউল কবির রচনায় সুলভ নয়। লালন শাহ্‌ এই শব্দের যে ব্যখ্যা দান করেছেন—তা বেশ পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাউলেরা 'অনুসন্ধানী'ও বটে।

বাউল-পরিচয়

বাউলদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক নিয়ম কানুন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বজ্রযানী বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁদের একটি ঐতিহ্যগত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এমন কি সাধন প্রক্রিয়ার বাহ্য রূপের সঙ্গেও

এ-যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বজ্রযানী সহজিয়া বৌদ্ধগণ 'মণ্ডল চক্ক' (মণ্ডল চক্র) দ্বারা হেরুকের সাধনা করতেন।'[৯১] এই চক্রে নারীরাও গৃহীত হোত। কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষের ঊনত্রিশ শ্লোকে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯২] উল্লেখযোগ্য যে, বাউলরাও রাত্রিকালে নর-নারী সম্মিলিত হয়ে 'চক্রে' বসে। 'সহজ সাধনা,' 'দেহ সাধনা' প্রভৃতির সন্ধানও বজ্র-গীতিকাতেই প্রথম লাভ করা যায়। বাউলদের সহজরূপের সাধনা এবং দেহ সাধনার মূল প্রবর্তক যে বজ্রযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরে এই সাধনা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমগ্র বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য যোগ এবং তন্ত্রে-ও দেহ-সাধনা মূল কথা এ হিসেবে, বৌদ্ধগণ যোগী ও ও তান্ত্রিকদের নিকট ঋণী; কিন্তু বাউলরা দেহ-তত্ত্ব সাধনা, সরাসরি বৌদ্ধ গুরু পরম্পরায় লাভ করেছে; যোগী ও তান্ত্রিকদের নিকট থেকে নয়।

'চর্যাগীতি' থেকে সেকালের বাউলদের যে পরিচয় লাভ করা যায় তা হোল তাঁরা নগরপ্রান্তে বাস করতেন, হাড়মালা ধারণ করতেন, নাচগান তাঁদের সাধনার অঙ্গ ছিল। এসমাজে অবাধ যৌন স্বাধীনতার ভিত্তিতে ধর্মচর্চা হোত। চণ্ডালী, ডোমনী, অবধুতী শবরী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকদের সংসর্গে তাঁরা সহজ-সাধনা করতেন। কানে কর্ণকুণ্ডল, বজ্র প্রভৃতি পরা হোত এবং আধুনিক বাউলদের একতারার মত বাদ্যযন্ত্র সাধকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সমাজে তাঁরা শ্রদ্ধেয় ছিলেন না। তাঁদের নগরপ্রান্তে বাস করতে হতো। নেড়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের উপর অত্যাচার করত। তখনকার বাউলদের পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে একাভিপ্রায়ী বৌদ্ধেরা নীলরঙের আল্‌খাল্লা পরতেন। সে পোষাক বজ্রযানী সহজিয়া বৌদ্ধ বাউলদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে এ সব বাউল নর-নারীর ভয়াবহ অধঃপতন হওয়ায়

---

৯১ দ্রষ্টব্য, শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৭।

৯২ দ্রষ্টব্য, শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃঃ১৩২।

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাঁদের প্রতি ক্রমশঃ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। এ-সময় 'বাউল' শব্দটির ও অর্থের অবনতি ঘটে। বাউলরা ও নিন্দিত হন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'এর উক্তি—

'মুকুল (ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষস রাক্ষস বুলে রণে।'

মধ্যযুগের মধ্যভাগে বাউলদের অধপতনের অবস্থানটা ছিল এরকমই।[৯৩] উদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে জানা যায় বৌদ্ধ বাউলরা তখন বাবরী চুল মাথায় নিয়ে উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় ভ্রমণ করে বেড়াতেন। আধুনিক কালের বাউলরাও ভ্রমণশীল এবং বাবরীচুলের অধিকারী।

বাঙলায় মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও বাঙলা দেশে ইসলাম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সূফী-পীর-দরবেশদের প্রভাবে সহজিয়া বৌদ্ধেরা হিন্দুদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে বহুসংখ্যায় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইস্‌লাম ধর্মের অভ্যন্তরে থেকে তাদের পূর্ব বিশ্বাস ও ধর্মাচারকে নানা ভাবে ইস্‌লামী চিন্তা-ধারার সঙ্গে সমন্বয়ে প্রয়াস পান। তার মূলে মধ্যযুগে মুসলমানদের মধ্যে নানা শ্রেণীর সূফী ও ফকীর সাধক-সাধিকার আর্বিভাব হয়। অন্যদিকে শ্রী চৈতন্যের সময় এবং পরবর্তীকালেও অনেক সহজিয়া বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়, এবং উক্ত ধর্মাশ্রয়ী রসবাদী এক শ্রেণীর রসিক বৈষ্ণবের উদ্‌ভব হয়। তাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েও ইস্‌লাম কিংবা বৈষ্ণব কোন ধর্মের আশ্রয়ে সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার্জন করতে পারেন নি। স্বধর্মচ্যুৎ এবং পরধর্মেও অব-হেলিত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের এই ধরণের সাধকরাই অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাউল। নানা স্থানে, নানা শাখা-প্রশাখায়, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নামে আত্মগোপনকারী তারা পূর্বতন বাজুলদেরই বংশধর।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' রসিক বৈষ্ণব বা রসবাদী বাউলদের যে পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়,—তা থেকে জানা যায়—তাঁরা নৃত্য-গীত করতেন, হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষায় কথা বলতেন। রাগানুগা সাধনা অঙ্গীকার করে বৌদ্ধ

৯৩ দ্রষ্টব্য, শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭

সহজসাধনার ধারাকে তাঁরা জীবন্ত রাখেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ-গাস্বামী ও রামানন্দের আচার ব্যবহারের উল্লেখ করে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এবং পরবর্তীকালের ও বাউলগণ তাঁদের স্বগোত্রীয় বলে দাবী তুলেছেন। তাঁদের এ দাবীর সত্যাসত্য সম্পর্কে অবশ্যই মতভেদের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু বাউল-দের যুক্তি একেবারে উপেক্ষা করার কোন হেতু নেই। কারণ সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবধর্মের আবরণ ছিন্ন করেই রসবাদী গুপ্ত বাউল সম্প্রদায় প্রকাশ্যে আত্মপরিচয় দিতে থাকে।[১৪] তখন কুলীন বৈষ্ণবেরা তাদের নেড়ানেড়ী নামে অভিহিত করেন। এ সময় মুসলমানদের মধ্য থেকেও কোন কোন শ্রেণীর ফকীর এসে এই নেড়ানেড়ীর দল পুষ্ট করেন এবং ধীরে ধীরে এ সম্প্রদায়ে মুসলমান (?) সাধক সাধিকারাই সংখ্যাধিক্য লাভ করে। ফলে উনিশ ও বিশ শতকে 'নেড়ানেড়ী' শব্দটি বৌদ্ধদের পরিবর্তে এই শ্রেণীর মুসলমানদের পরিচিতি হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বাদশ শতক থেকে 'বৌদ্ধ' (বা 'বাজুল') এই নাম ঘৃণার বিষয় হয়ে ওঠায়[১৫] 'বাউল' শব্দটির অর্থাবনতি ঘটে এবং সমকালীন কাব্য ও বৈষ্ণব গীতি কবিতায় তা' 'পাগল,' উন্মাদ" বিরহ ব্যাকুল; ক্ষিপ্ত, গৃহহীন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। বৌদ্ধ 'বাজুল'দের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যেত। মঠবাসী খাঁটি বৌদ্ধদের ন্যায় তাঁরা গৃহবাসী ছিলেন না; আখড়াই ছিল তাঁদের প্রধান আবাসস্থল। এ জন্য 'গৃহহীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হয়। তাঁরা এক স্থানে অবস্থান করতেন না, জীবিকার জন্য অর্থনৈতিক কারণে তাঁদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতে হোত। এজন্য 'উদাসীন' অর্থেও 'বাউল' শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। তাঁরা একতারা বাজিয়ে আপন খেয়ালে নেচে গেয়ে ভিক্ষা করতেন; তাঁদের কথা ছিল দুর্বোধ্য, হেঁয়ালীপূর্ণ—এজন্য

---

১৪ দ্রষ্টব্য, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

১৫ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৮।

জনসাধারণ তাঁদের সাধারণ অর্থে পাগল বলে অভিহিত করত। ফলে সাধারণভাবে 'বাতুল' 'বাউর' বা 'পাগল' অর্থেও 'বাউল' শব্দের প্রচলন হয়। বাউলগণ ঐশ্বরিক প্রেমে ও বিরহ বেদনায় কাতর হয়ে গানে গানে তাঁদের 'মনের মানুষ'-এর অনুসন্ধান করতেন—এজন্য 'বিষাদিত', 'বিরহ-ক্লিষ্ট' 'আসক্ত' ইত্যাদি অর্থেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ। তাঁদের 'মনের মানুষ' 'সোনার মানুষ' 'অচিন মানুষে'র জন্য আত্যন্তিক ব্যাকুলতা থাকায়—'ব্যাকুল' বা 'আকুল' অর্থেও 'বাউল' শব্দের ব্যবহার অযৌক্তিক নয়। এরূপ বিভিন্নকালে, স্থান ও ভাষায় বাউলদের আংশিক পরিচিতি রূপে নানা অর্থে 'বাউল' শব্দের রূপবৈচিত্র্য ও অর্থবৈচিত্র্য ঘটে।

অতএব 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ে এ শব্দটির অর্থের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও সাধনার ইতিহাস এবং তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় থেকেই 'বাউল' শব্দ ও গোষ্ঠীর সঠিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব।

বস্তুত বজ্রযানী বৌদ্ধরাই বাউলদের আদিপুরুষ এবং 'বজ্রী' শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি। আর বজ্র-গীতিকাই আদি বাউল গান॥